The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXIX (Issue 2), 2023 (pp.109 - 120)
Published in December, 2025

সন্ত্রাসবাদ ও মানবাধিকারঃ একটি নৈতিক পর্যালোচনা

মোহাম্মদ নাজেমুল আলম*

প্রতিপাদ্যসার: মানবাধিকারের উপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব বা হুমকি প্রদানকারী বিষয়গুলোর মধ্যে সন্ত্রাসবাদ উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা নীতিগত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত গণবিধ্বংসী কার্যকলাপ যা জনমনে ভীতির সঞ্চার করে কিংবা আইনবহির্ভূত ইচ্ছাকৃত ক্রিয়াকলাপ যা সাধারণ জনগণের নিরাপত্তার বিষয়কে উপেক্ষা অথবা হুমকি প্রদান করে তাই সন্ত্রাসবাদের অন্তর্ভুক্ত। সন্ত্রাসবাদ বিশ্বব্যাপী একটি উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে, যা শান্তি, নিরাপত্তা এবং মানবাধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করছে। সন্ত্রাসবাদের সাথে সংশ্লিষ্ঠ ব্যক্তিরা কোন না কোন জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ফলে সন্ত্রাসবাদ শুধুমাত্র সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের স্বীকার ব্যক্তির মানবাধিকারই ক্ষুণ্ন করেনা বরং উগ্রবাদ ছড়ানো চরমপন্থী সংগঠনগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত নিরপরাধ ব্যক্তিদের মানবাধিকারও ক্ষুণ্ন করে। কেননা অপরাধীর সাথে জাতি, ধর্ম, বর্ণ কিংবা অন্য কোন ক্ষেত্রে মিল থাকায় নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতি সমগ্র বিশ্বব্যাপী মানুষের কুসংস্কার এবং বিরূপ ধারণার জন্ম নেয়। অর্থাৎ কারো ক্ষতি না করেও চরমপন্থী সংগঠনের সাথে সম্পর্কযুক্ত নিরপরাধ ব্যক্তিকে অনেক সময় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ, আইনি ব্যবস্থা ও সাধারণ জনগণের কাছ থেকে অন্যায় আচরণের স্বীকার হতে হয়। এমনকি শিক্ষা, কর্মসংস্থান, ভিসা প্রাপ্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈষম্যের সম্মুখীন হওয়ার পাশাপাশি সমাজ থেকে বহিষ্কার হতেও দেখা যায় যা তাদের মৌলিক মানবাধিকারের লঙ্ঘন। চরমপন্থী সংগঠনগুলির সাথে জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা গোষ্ঠীগত মিল থাকায় এসব নিরপরাধ ব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের স্বীকার করা নৈতিক দিক থেকে কতটুকু সঠিক তা পর্যালোচনা করাই এই গবেষণা প্রবন্ধের লক্ষ্য।

১. ভূমিকাঃ

সন্ত্রাসবাদ একটি জটিল এবং বহুমুখী বিষয়। এটি বিশ্বব্যাপী ব্যক্তি, সম্প্রদায় এবং সমাজের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। সন্ত্রাসবাদ গণতন্ত্রের নীতি, আইনের শাসন, সার্বজনীন মানবাধিকার এবং পরমতসহিষ্ণুতাসহ ব্যক্তি স্বাধীনতার নৈতিক মূল্যবোধের প্রকাশ্য বিরোধী (Jeknić, Gordana Paović, Sonja Tomović-Šundić, and Ivan Jeknić 25)। যদিও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিদের মানবাধিকারের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু যারা এই ধরনের কাজে জড়িত নয় বা এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করেনা সেইসব ব্যক্তিদের মানবাধিকারের উপরও সন্ত্রাসবাদ যে গভীর প্রভাব ফেলে তা বলার অবকাশ রাখেনা। সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন না করা সত্ত্বেও চরমপন্থী সংগঠনের সাথে পারিবারিক, সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোনো সম্পর্ক থাকার কারণে নিরপরাধ ব্যক্তিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে থেকে অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। এই চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে অসুবিধা, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সার্বক্ষণিক উচ্চতর নজরদারি, সামাজিকভাবে বর্জন এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি। এই নিরপরাধ ব্যক্তিরা সন্দেহের জালে আটকা পড়ে, যেখানে তাদের ক্রিয়াকলাপ এবং সংশ্লিষ্টতাগুলি ক্রমাগত যাচাই করা হয় এবং তাদের মৌলিক অধিকার ভোগ করার স্বাধীনতা পর্যন্ত অস্বীকার করা হয়। এই নিবন্ধটি সন্ত্রাসবাদের নৈতিক প্রভাবসহ যারা চরমপন্থী সংগঠনগুলির সাথে পারিবারিক বা

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

অন্য কোনো দিক থেকে সম্পর্কিত হওয়ার কারনে কুসংস্কার এবং বৈষম্যের শিকার হয় সেসব নিরপরাধ ব্যক্তিদের দুর্দশার উপর আলোকপাত করে। মানবাধিকার নীতি এবং নৈতিক কাঠামোর উপর আলোকপাত করে, গবেষণাপত্রটি নিরপরাধ ব্যক্তির উপর এ ধরনের বৈষম্য ও কুসংস্কারের নেতিবাচক পরিণতিগুলিকে তুলে ধরে এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজের পক্ষাবলম্বন করে যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির মর্যাদা এবং অধিকারকে সম্মান করে।

১.১ সন্ত্রাসবাদ:

সন্ত্রাসবাদ একটি রাজনৈতিক ধারণা, কারণ এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক লক্ষ্য এবং নেতিবাচক রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে। Corlett, 2003; Meggle, 2005 কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞায়-সন্ত্রাসবাদ হলো রাজনৈতিক, আদর্শিক, সামাজিক বা ধর্মীয় লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সহিংসতা, ভীতি প্রদর্শন বা সহিংসতার হুমকি প্রদানের মাধ্যমে কোনো কাজ জোরপূর্বক আদায় করে নিতে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর চাপ প্রয়োগ। সহিংসতার ব্যবহার, ভীতি প্রদর্শন বা সহিংসতার হুমকি ব্যতীত ঐ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বেচ্ছায় কাজটি সম্পাদন করেনা। সন্ত্রাসবাদ বহু শতাব্দী ধরে এমন একটি ঘটনা হিসেবে পরিচিত, যা একটি নির্দিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সহিংসতা যেখানে, বিভিন্নভাবে ভয় দেখানো বা হুমকি প্রয়োগ করে রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করা হয় (Đorić 13)। রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা মতাদর্শগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার বা একটি সমাজকে জোরপূর্বক এবং ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে বেআইনিভাবে সহিংসতার ব্যবহারকে সন্ত্রাসবাদ বলা যায় (Hrabar 281)। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিরীহ বা অ-যুদ্ধরত মানুষ বা তাদের সম্পত্তির উপর ইচ্ছাকৃতভাবে সহিংস আক্রমণ করাই হলো সন্ত্রাসবাদ (Coady 2)।

সন্ত্রাসবাদ হলো একধরনের সহিংসতা এবং ভীতিপ্রদর্শন যা সমাজে আতঙ্ক ও ত্রাস সৃষ্টি করে রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা আদর্শিক উদ্দেশ্য অর্জন করতে চায়। এটি ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা রাষ্ট্র সত্ত্বা দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। সমাজের উপর তার নিজস্ব ধ্বংসাত্মক প্রভাবসহ এটি বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়। সন্ত্রাসবাদের বিভিন্ন রূপ এবং তাদের ধ্বংসাত্মক প্রভাবগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

আত্মঘাতী বোমা হামলা: এ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসীরা তাদের শরীরে বিস্ফোরক বেঁধে রাখে এবং বাজার, গণপরিবহন বা ধর্মীয় সমাবেশের মতো জনাকীর্ণ স্থানে বিস্ফোরণ ঘটায়। তাদের লক্ষ্য থাকে সর্বোচ্চ হতাহতের ঘটনা ঘটানো এবং জনগণের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করা।

নির্বিচারে গুলি চালানো: এ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী গণজমায়েত, যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় উপাসনালয়, থিয়েটার, সিনেমা হল বা কনসার্টে নির্বিচারে গুলি চালায়। এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড জনমনে ব্যাপক ত্রাস সৃষ্টি করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের উপর দীর্ঘস্থায়ী বিরূপ প্রভাব ফেলে।

অপহরণ ও জিম্মি: এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সন্ত্রাসীরা বিমান অপহরণ ও যাত্রীদের জিম্মি করে। নিজেদের সংগঠন ও আদর্শকে বিশ্বব্যাপী প্রচার করতে বা সরকারের কাছ থেকে দাবি আদায় করতে কিংবা সরকারকে তাদের উদ্দেশ্য মেনে চলতে বাধ্য করতে এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ব্যবহার করে । এই ঘটনাগুলি পরবর্তীতে ব্যাপক প্রাণহানি, ভয় এবং অস্থিতিশীলতার দিকে পরিচালিত হতে পারে।

সাইবার সন্ত্রাসবাদ: এই ধরনের সন্ত্রাসবাদে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো, যোগাযোগ নেটওয়ার্ক বা আর্থিক ব্যবস্থা ব্যাহত করার জন্য সাইবার আক্রমণ ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের সন্ত্রাসবাদের কারণে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবাগুলো ব্যাহত হয়ে ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি সংঘটিত হয়।

রাসায়নিক, জৈবিক, রেডিওলজিক্যাল এবং পারমাণবিক (CBRN) সন্ত্রাস: এ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসীরা সর্বাধিক প্রাণহানি এবং ব্যাপক ভয় সৃষ্টি করতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহার করে। CBRN হামলার হুমকি রাষ্ট্রকে ব্যাপক সামাজিক অস্থিরতার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

বিদ্রোহ এবং গেরিলা যুদ্ধ: রাজনৈতিক বা জাতিগত দ্বন্দ্ব দ্বারা প্রভাবিত অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহ এবং গেরিলা যুদ্ধে রূপ নিতে পারে। এই ধরনের সন্ত্রাসবাদের ফলে বেসামরিক হতাহত, বাস্তুচ্যুতি এবং গভীর সামাজিক ব্যাঘাত ঘটে।

রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ: কিছু সরকার নিজেদের স্বার্থ আদায় বা অন্য দেশগুলোকে অস্থিতিশীল করতে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে সমর্থন করতে পারে। রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

২. মানবাধিকার:

মানব পরিবারের সকল সদস্যের জন্য সার্বজনীন, সহজাত, অহস্তান্তরযোগ্য এবং অলঙ্ঘনীয় অধিকারই হলো মানবাধিকার (Wikipedia)। Micheline Ishay এর মতে, মানবাধিকার কোনো একক বা নির্দিষ্ট ধারণা নয়, বরং একটি বহুমাত্রিক ও ঐতিহাসিক ধারণা যা লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা বা অর্থনৈতিক পটভূমি নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। তিনি এই অধিকারগুলোকে মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য ও অপরিবর্তনীয় অংশ হিসেবে বর্ণনা করেছেন যা তাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (Ishay 359-362)। মানবাধিকারের মধ্যে রয়েছে জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার, দাসত্ব ও নির্যাতন থেকে মুক্তি, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, কাজ ও শিক্ষার অধিকার প্রভৃতি। মানব পরিবারের সকল সদস্যই কোনোপ্রকার বৈষম্য ছাড়াই এই অধিকারগুলি পাওয়ার অধিকারী (United Nations)। মানবাধিকার হল মানুষের আচরণের নির্দিষ্ট মানদণ্ডের নৈতিক নিয়ম বা আদর্শ এবং এই অধিকারগুলো পৌর ও আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা সুরক্ষিত। মানবাধিকার হল এমন কিছু আদর্শ যা গুরুতর রাজনৈতিক, আইনি এবং সামাজিক অপব্যবহার থেকে সর্বত্র সকল মানুষকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর (Nickel)। এই অধিকারগুলো মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র দ্বারা স্বীকৃত যা সমস্ত মানুষের অধিকার এবং স্বাধীনতাকে সংহত করে। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র একটি আন্তর্জাতিক দলিল যা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সালে অনুমোদিত হয়। এই ঘোষণায় একজন ব্যক্তির "মৌলিক অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা" সম্পর্কে বিস্তারিত ৩০টি অনুচ্ছেদ রয়েছে যা সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য বলে নিশ্চিত করা হয়েছে (Wikipedia)।

২.১ মানবাধিকারের উপর সন্ত্রাসবাদের প্রভাব:

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানোর সময় অপরাধীদের প্রায়ই লক্ষ্য থাকে ভয় সৃষ্টি করা, সামাজিক সম্প্রীতি ব্যাহত করা এবং সমাজের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্বল করা। সন্ত্রাসবাদ মানবাধিকারের উপর গভীরভাবে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলে, কারণ এটি সরাসরি নিরীহ জনগণকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে এবং তাদের গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও মর্যাদার মৌলিক নীতিগুলিকে অবমাননা করে। সন্ত্রাসবাদ ব্যক্তির জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার এবং নিরাপত্তাসহ মৌলিক মানবাধিকারের নীতিগুলি লঙ্ঘন করে। মানবাধিকারের উল্লেখযোগ্য দিক ও এর উপর সন্ত্রাসবাদের বিরূপ প্রভাবসমূহ তোলে ধরা হলো:

জীবনের অধিকার: সন্ত্রাসীরা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং নির্বিচারে বেসামরিক নাগরিকদেরকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে, যার ফলে বিপুলসংখ্যক প্রাণহানি ঘটে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ও তাদের পরিবার অপরিসীম দুর্ভোগের শিকার হয়। নিরীহ

মানুষ যখন সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয় তখন তাদের জীবনের অধিকার (যা অন্যতম প্রধান মৌলিক মানবাধিকার) লঙ্ঘিত হয়।

নিরাপত্তার অধিকার:
সন্ত্রাসবাদ সমাজের মধ্যে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ তৈরি করে। জনগণ সবসময় সম্ভাব্য আক্রমণের ভয়ের মধ্যে থাকে, যার ফলে তাদের নিরাপত্তার অধিকারকে বিসর্জন দিতে হয় যা তাদের জীবনযাত্রার মানকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সংগঠনের অধিকার:
সন্ত্রাসবাদের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে ভিন্নমতকে নীরব করা এবং সংগঠন ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে দমন করা। সহিংসতার ভয় নাগরিককে তাদের মতামত প্রকাশ করতে, শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করতে বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে বাধাগ্রস্ত করে।

অত্যাচার, অমানবিক এবং নিষ্ঠুর আচরণ থেকে বাঁচার অধিকার: ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলো নির্যাতন এবং মৃত্যুদণ্ডের মতো নৃশংস কৌশল ব্যবহার করে থাকে। এটি মানব মর্যাদার মৌলিক নীতি এবং নির্যাতন ও নিষ্ঠুর আচরণ থেকে বাঁচার অধিকারকে লঙ্ঘিত করে।

শিক্ষার অধিকার: সন্ত্রাসীরা স্কুল, শিক্ষক এবং ছাত্রদের আক্রমণ করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে। সহিংসতার ভয়ে শিশুরা স্কুলে যেতে নিরুতসাহিত হতে পারে, যা ফলশ্রুতিতে তাদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সাথে সাথে তাদের ভবিষ্যত সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

শরণার্থী এবং আশ্রয়প্রার্থীদের অধিকার: সন্ত্রাসবাদ সংঘাতকে বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং জনগণকে ব্যাপকভাবে বাস্তুচ্যুত করতে পারে। সন্ত্রাসবাদের শিকার রাষ্ট্রের জনগণ প্রায়শই সহিংসতা এবং নিপীড়ন থেকে পালিয়ে অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় প্রার্থী বা শরণার্থী হয়ে যায়। এই শরণার্থী শিবিরেও তারা বিভিন্নভাবে দুর্দশার সম্মুখীন হয় বা তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। যদিও সন্ত্রাসবাদের শিকার ব্যক্তিরা সবচেয়ে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়, পাশাপাশি পরোক্ষভাবেও অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সন্ত্রাসবাদী সম্প্রদায়ের নিরপরাধ সদস্য, যারা সন্ত্রাসবাদীদের অন্তর্গত বৃহত্তর জাতিগত, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী হিসেবেও পরিচিত, কয়েকটি চরমপন্থীর কর্মকাণ্ডের কারণে নিম্নোক্ত বৈষম্য, হয়রানি এবং সহিংসতার সম্মুখীন হতে পারে:

বদ্ধমূল ধারণা এবং কুসংস্কার:
একটি সন্ত্রাসী হামলার পরে, প্রায়ই অপরাধীদের কর্মের সাথে সমগ্র সম্প্রদায়কে যুক্ত করার প্রবণতা দেখা যায়। এটি একই জাতি, ধর্ম বা সাংস্কৃতিক পটভূমির অন্তর্ভুক্ত নিরপরাধ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক বদ্ধমূল ধারণা এবং কুসংস্কারের জন্ম দেয়। সন্ত্রাসবাদ প্রায়ই নির্দিষ্ট ধর্মীয়, জাতিগত বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে কলঙ্কিত করে। এই সম্প্রদায়ের নিরপরাধ সদস্যরা কিছু চরমপন্থীর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে বৈষম্য, হয়রানি এবং সহিংসতার সম্মুখীন হতে পারে। সন্ত্রাসবাদের একটি উল্লেখযোগ্য বিরূপ পরিণতি হল চরমপন্থী গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত বা সহানুভূতিশীল বলে মনে করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কুসংস্কারের উত্থান। এই কুসংস্কার ভয়, ভুল বোঝাবুঝি থেকে জন্ম নেয়, যা নির্দোষ ব্যক্তিদেরকে অপরাধীর তকমা দেয়। সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন না করেও এবং কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত না থাকা সত্ত্বেও অনেক নির্দোষ ব্যক্তি প্রায়শই প্রান্তিকতা, বৈষম্যসহ বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের সম্মুখীন হয়। তাছাড়া বিশেষ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার কারণে অনেকে সন্দেহভাজন হিসেবে বিবেচিত হওয়ার নজিরও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মিশরীয় নাগরিককে সন্দেহভাজন হিসেবে দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে

আটক করে রাখা হয়েছিল কারণ সে ফ্লোরিডার একটি ফ্লাইট স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন এবং সেন্ট লুইসে একটি এয়ারলাইনসের মেকানিক হিসেবে কাজ করতেন (Groetker 312-313)।

ভয় ও অবিশ্বাস:
সন্ত্রাসী হামলা সমাজে ভয় ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করে। যারা আলাদাভাবে দেখতে বা ভিন্ন পোশাক পরিধান করে কিংবা একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্গত লোকদেরকে সমাজের অন্যরা সন্দেহের চোখে দেখে। এই সন্দেহের ফলে বৈষম্য প্রদর্শন, তাদেরকে শত্রু হিসেবে গণ্য করা, এমনকি তাদেরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন পর্যন্ত করে দেয়া হয়।

মিডিয়া আগ্রাসন:
সন্ত্রাসী ঘটনার মিডিয়া কভারেজ কখনও কখনও অনিচ্ছাপূর্বক কিছু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নেতিবাচক ধারণার জন্ম দিতে পারে। বৃহত্তর প্রেক্ষাপট প্রদান না করে মিডিয়া প্রতিবেদন যদি শুধুমাত্র অপরাধীদের জাতি বা ধর্মের উপর আলোকপাত করে, তাহলে এটি চরমপন্থী সম্প্রদায়ের নির্দোষ সদস্যদের প্রতি বিদ্যমান বৈষম্য ও কুসংস্কারকে শক্তিশালী করতে পারে।

প্রতিশোধমূলক আক্রমণ:
সন্ত্রাসী হামলার পর এমন কিছু ঘটনা ঘটে যেখানে ব্যক্তি বা জনতা রাগ এবং ভয়ের বর্শবর্তী হয়ে সন্ত্রাসী সম্প্রদায়ের নিরপরাধ সদস্যদের বিরুদ্ধে সহিংসতায় লিপ্ত হয়েছে। এই প্রতিশোধমূলক আক্রমণগুলি প্রায়শই দোষ বা নির্দোষতার যৌক্তিক মূল্যায়নের পরিবর্তে প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা উস্কে দেওয়া হয়।

বিদ্বেষমূলক বক্তৃতা এবং অনলাইন বিভ্রান্তিঃ নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো এবং উস্কানি দেওয়ার জন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলি জনপ্রিয় ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সমগ্র সন্ত্রাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণাত্মক বক্তব্য এবং মিথ্যা তথ্যের বিস্তার সমাজে উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলে এবং নিরপরাধ ব্যক্তিদেরকেও ঘৃণার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে।

সরকারী নীতি এবং প্রোফাইলিং:
নিরাপত্তার নামে কিছু সরকার এমন নীতি বাস্তবায়ন করতে পারে যা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে অসমভাবে টার্গেট করে। এর মধ্যে বর্ধিত নজরদারি, জাতিগত প্রোফাইলিং, পৃথক ভিসা নীতি বা নিষেধাজ্ঞামূলক অভিবাসন ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য যা সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নির্দোষ ব্যক্তির উপরও বিরূপ প্রভাব ফেলে। আধুনিক নজরদারি ব্যবস্থায় দিন দিন গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম এবং বায়োমেট্রিক শনাক্তকরণের মত উচ্চ প্রযুক্তিগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে (Bewley-Taylor)। নজরদারি প্রযুক্তি এবং ডেটা স্ক্রিনিং-এর ব্যবহার উভয়ই প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের পাশাপাশি গোপনীয়তা ও নাগরিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ সম্পর্কিত বিষয়গুলো সামনে নিয়ে আসে।

আইনি সুরক্ষার অভাব:
সন্ত্রাসী হামলার পর সরকার কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে গিয়ে আইনের শাসন এবং মানবাধিকার ক্ষুণ্ন করে। এর মধ্যে অন্যায়ভাবে নিরপরাধীদের আটক, ন্যায়বিচারের অভাব এবং নির্বিচারে শক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। কিছু ক্ষেত্রে, পর্যাপ্ত আইনি সুরক্ষার অভাব বা বৈষম্য প্রতিরোধের জন্য তৈরি করা আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা বৈষম্যের সম্মুখীন হতে পারে।

পৃথকীকরণ এবং বিচ্ছিন্নতাঃ ভয় এবং কুসংস্কার নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে, যা নিরপরাধ ব্যক্তিদের জন্য সম্পদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং কাজের সুযোগ লাভ করা কঠিন করে তোলে।

আন্দোলনের অধিকার খর্ব: সন্ত্রাসবাদ দমনের উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে গিয়ে সরকার একটি দেশের অভ্যন্তরীণ এবং সীমান্তবর্তী এলাকা জুড়ে আন্দোলনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। এই বিধিনিষেধ মানুষের নিরাপত্তা, আশ্রয় বা উন্নত জীবনের দাবিতে আন্দোলনের অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।
গোপনীয়তার অধিকার খর্ব:
সন্ত্রাস-বিরোধী প্রচেষ্টা, যেমন- ব্যাপক নজরদারি, ব্যক্তিদের গোপনীয়তা এবং তথ্য সুরক্ষার অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে। কারণ- সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের জন্য সরকার এই পদক্ষেপগুলিকে অতীব প্রয়োজনীয় হিসেবে ন্যায্যতা দিতে পারে।

৩. নৈতিক বিশ্লেষণ:

শুধুমাত্র অ-রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠী (non-state agents) নয়, রাষ্ট্র নিজেও সন্ত্রাসবাদে জড়িত হতে পারে। যেমন, কোনো সরকার যদি বিপ্লবী কার্যক্রম দমন করতে নিরপরাধ জনগণ, কৃষক বা শ্রমিকদের উপর আক্রমণ করে, তাহলে সেটি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ (state terrorism) হিসেবে গণ্য হবে (Coady 4)।

কিছু দার্শনিক, যেমন মাইকেল ওয়ালজার, মনে করেন যে, অত্যন্ত জরুরি পরিস্থিতিতে (Supreme Emergency) অ-যুদ্ধরতদের উপর আক্রমণ করা নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে (Walzer 1998)। এই ধারণাটি Machiavelli এবং Max Weber এর দর্শনে 'ডার্টি হ্যান্ডস' (dirty hands) নামে পরিচিত, যেখানে বৃহত্তর কল্যাণের জন্য একজন রাজনৈতিক নেতাকে খারাপ কাজ করতে বাধ্য হতে হয়। যেমন: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনী জার্মানির নাৎসি শাসনের আসন্ন বিজয় ঠেকানোর জন্য জার্মান শহরগুলোতে বোমা ফেলেছিল। এটা ছিল "সুপ্রীম ইমার্জেন্সি"র উদাহরণ। তাদের মতে, যুদ্ধ থামানোর জন্য এই ধরনের হামলা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই কৌশল 'ন্যায় যুদ্ধ তত্ত্ব' (just war theory) অনুযায়ী অনৈতিক। কারণ, এটি *'jus in bello'* (যুদ্ধের নিয়মাবলি)-এর মূল নীতি, অর্থাৎ যারা যুদ্ধ করছে না, তাদেরকে আক্রমণ না করার নীতিটি লঙ্ঘন করে। তাছাড়া, রাষ্ট্রকে যদি 'সুপ্রিম ইমার্জেন্সি'র নামে নিরীহ মানুষকে আক্রমণ করার নৈতিক অনুমোদন দেয়া হয়, তবে - বিপ্লবী বা নিপীড়িত গোষ্ঠীও তাদের অস্তিত্বের জন্য একই যুক্তি ব্যবহার করতে পারে। আবার, ওয়ালজার এর যুক্তিটি অ-রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীগুলোর জন্য নয় বরং শুধুমাত্র রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক নেতাদের জন্য প্রযোজ্য। যার ফলে, এটি রাষ্ট্রের প্রতি পক্ষপাত (Pro-state Bias) এবং অ-রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীগুলোর প্রতি এক প্রকার বৈষম্যও বটে (Coady 783)। অ-যুদ্ধরতদের উপর কোন ধরনের আক্রমণ, চাপ প্রয়োগ বা বৈষম্য সৃষ্টি সবসময়ই নৈতিকভাবে ভুল এবং কখনোই এর অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। বৈষম্যের ব্যবহার কোন কোন পরিস্থিতিতে ন্যায্য বা অন্যায্য হতে পারে সে সম্পর্কিত আলোচনা ফলাফলবাদী এবং উদ্দেশ্যবাদী নীতিশাস্ত্রের মধ্যকার বিস্তৃত বিতর্ক সৃষ্টি করে।

৩.১ বৈষম্যের নৈতিক ন্যায্যতা:

সন্ত্রাসবাদের সমর্থক না হয়া সত্ত্বেও নিরপরাধ ব্যক্তিদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার যে চর্চা তার নৈতিক প্রভাব বোঝার জন্য এই ধরনের চর্চার নৈতিক বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য। জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা অনুভূত গোষ্ঠী সাদৃশ্যের ভিত্তিতে ব্যক্তির উপর বৈষম্য-ন্যায়বিচার, সমতা এবং মানব মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধার নীতিগুলিকে ভূলুণ্ঠিত করে। মানুষ স্বায়ত্তশাসন ও ব্যক্তিগত মর্যাদার অধিকারী হয়ে জন্মায়। কোনো ব্যক্তি যদি কারো ক্ষতি না করে তবে তাকে তার জীবন, স্বাধীনতা, মত প্রকাশ, এবং গোপনীয়তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা সামাজিক ও নৈতিক উভয় ন্যায়বিচারের লঙ্ঘন। ব্যক্তিকে শুধুমাত্র তার নিজের কর্মের জন্য দায়ী করা যায়। এ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে কেউ যুক্ত থাকলে তাকে কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দেয়া নৈতিক। কিন্তু কেউ যদি চরমপন্থীদের সাথে যুক্ত না হয় তাহলে চরমপন্থী গোষ্ঠীর সাথে কেবল জাতি, ধর্ম বা বর্ণগত মিল থাকার কারণে তাকে দোষারোপ করে তার প্রাপ্য

অধিকার খর্ব করা ন্যায়সঙ্গত নয়। নৈতিকতার ক্ষেত্রে দায়িত্ব কেবল নৈতিক কর্তার ওপর বর্তায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় অপরাধটি করেছে সেই কেবল ঐ অপরাধের জন্য দায়ী। সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর কতিপয় সদস্যদের অপরাধের জন্য সে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অন্য কোনো নিরপরাধীকে শাস্তি দেয়া কিংবা তাকে সমাজের জন্য হুমকি মনে করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখানো সমষ্টিগত শাস্তির সমতুল্য যা সম্পূর্ণভাবে অনৈতিক। নিরপরাধ ব্যক্তিকে শুধু তার ধর্ম, বর্ণ কিংবা জাতিগত মিল থাকার কারণে হয়রানি করা রলসের ধারণার পরিপন্থী। প্রখ্যাত দার্শনিক জন রলস তাঁর 'A Theory of Justice' গ্রন্থে ন্যায়সঙ্গত সমাজ বলতে এমন সমাজকে বুঝিয়েছেন যেখানে প্রতিটি সদস্যের প্রতি সমান আচরণ দেখানো হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের আচরণে সুস্পষ্ট কোনো নৈতিক ত্রুটি দেখা যায় (Rawls 6-7)। কেবল গোষ্ঠীগত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে নিরপরাধ ব্যক্তিদের দোষী হিসেবে গণ্য করা তাদের মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন করা শামিল, এবং এই ধরনের বৈষম্য দুইটি নৈতিক ন্যায্যতার প্রশ্নের সম্মুখীন হয়।

প্রথমত, বৈষম্য ও কুসংস্কার মানব মর্যাদার সমতানীতিটি লঙ্ঘন করে। Moeckli (2005) এর মতে, সন্ত্রাসবিরোধী প্রচেষ্টায় ব্যবহৃত জার্মান Rasterfahndung এর ন্যায় ব্রড প্রোফাইল সম্পর্কিত পদক্ষেপগুলো, ইউরোপীয় মানবাধিকার কনভেনশনে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ১৪ এর বৈষম্যহীনতার নীতিটি লঙ্ঘন করে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী প্রভৃতি নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি সমান সম্মান, আচরণ এবং সুযোগ পাওয়ার যোগ্য। নিরপরাধ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হলে তাদের অন্তর্নিহিত মূল্য ক্ষুণ্ন হয়। যার ফলে, ব্যক্তিগত যোগ্যতার ভিত্তিতে সমাজে উন্নতি ও অবদান রাখার যে সুযোগ তাদের থাকে তাও অস্বীকার করা হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতি উপাদানগুলোর উপর ভিত্তি করে বৈষম্যমুলক আচরণ নৈতিক মূল্যবোধ, ন্যায্যতা এবং ন্যায়বিচারের নীতিগুলির বিপরীতে অবস্থান করে।

দ্বিতীয়ত, এই বৈষম্যমূলক আচরণ সামাজিক বিভাজনকে দীর্ঘস্থায়ী করে এবং ক্ষতিকারক রীতিগুলোকে শক্তিশালী করে তোলে। চরমপন্থী সংগঠনের সাথে জাতি, ধর্ম, বা বর্ণগত সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে পৃথক করার কারণে "আমাদের বনাম তাদের" মানসিকতা সৃষ্টি হয় যা ফলশ্রুতিতে কুসংস্কার এবং শত্রুতাকে উৎসাহিত করে। জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্য করা অন্যায়। কারণ- এ ধরনের বৈষম্য তাদেরকে সমাজে অযোগ্য ও অবাঞ্ছিত হিসেবে চিহ্নিত করে (Donahue, 2013)। এটি নিরপরাধ ব্যক্তিদের আরও একঘরে করে ফেলে, সামাজিক সংহতিকে বাধাগ্রস্ত করে, এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের বিকাশকে বাধা দেয়।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা (১৯৪৮) স্বাধীনতা এবং অধিকারসমূহে গোষ্ঠী, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্যবিধ মতামত, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য কোনো মর্যাদা প্রভৃতি নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই সমান অধিকারের প্রতিশ্রুতি দেয়।

৩.২ কাউন্টার-টেরোরিজম ঃ

সন্ত্রাসবাদ দমনে জিজ্ঞাসাবাদ, নির্যাতন, ডেটা স্ক্রিনিং, উচ্চ প্রযুক্তিগত নজরদারি, নাগরিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকারকে বাধাগ্রস্থ করে এমন আইন আরোপসহ রাষ্ট্র কর্তৃক অনেকগুলি নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ গৃহীত হয়। উদাহরণস্বরূপ ইসরায়েলে, পুলিশ কোনো বিশেষ কারণ বা সন্দেহ ছাড়াই যেকোনো সময় নাগরিক এবং তাদের জিনিসপত্রের উপর তল্লাশি চালাতে পারে। এই তল্লাশিগুলো শপিং সেন্টার, বিমানবন্দর, স্টেডিয়াম এবং অন্যান্য সর্বজনীন জনবহুল স্থানে পরিচালিত হয়। পাবলিক প্লেসে প্রবেশের আগে সকল নাগরিকদেরকে মেটাল ডিটেক্টরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কানাডায়, পুলিশ কোনো অভিযোগ এবং জামিন ছাড়াই সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও নব্বই দিন পর্যন্ত আটকে রাখার অনুমতি পায়। কানাডার এন্টি-টেররিজম অ্যাক্টের মতো আইন গুলো সে দেশে বসবাসরত মুসলিমদের ওপর অনেক বেশি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাছাড়া এই

আইনগুলো প্রয়োগের সময় কানাডায় মুসলমানদের প্রতি যে ভুল ধারণা ঐতিহাসিকভাবে প্রচলিত আছে সে পুরনো ধারণাকে আরো শক্তিশালী করার পাশাপাশি মুসলমানদের একটি গোষ্ঠীকে সন্ত্রাসী হিসেবে দেখা হয় যার ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণ গোষ্ঠীর ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে (Bhabha 95)। তাছাড়া সমাজে তাদের অবস্থান আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনকি এই ভুল ধারণার কারনে তারা ভুলভাবে টার্গেটেড হবার ভয়ে নিজেদের মত প্রকাশ করতে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেও ভয় পায়। ফ্রান্সে কোনো অভিযোগ ছাড়াই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সন্দেহভাজনদের প্রায় পাঁচ দিন ধরে আটকে রাখা যায় এবং আটককৃত ব্যক্তি এই পাঁচদিন কোনো আইনজীবীর সাথেও যোগাযোগ করতে পারেনা। ব্রিটেনের সন্ত্রাসবিরোধী আইন সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আদালতে হাজির করা ছাড়াই সাত দিন পর্যন্ত আটকে রাখার অনুমতি দেয়। মার্কিন কংগ্রেসের প্রস্তাবিত সন্ত্রাসবিরোধী আইন কর্তৃপক্ষকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য সন্দেহভাজন বিদেশিদের এক সপ্তাহ পর্যন্ত কোনো অভিযোগ ছাড়াই আটকে রাখার অনুমতি দেয় (White, JE. 6)। অভিযোগ ছাড়া এবং জামিন ছাড়াই এই অনির্দিষ্টকাল ধরে আটকে রাখার ফলে অনেক নিরপরাধ ব্যক্তির মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হয় যা নৈতিক দিক থেকে অগ্রহণযোগ্য। কানাডায় বসবাসরত কিন্তু নাগরিক নয় এমন মুসলমানদের জন্য বৈষম্যের মত মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হবার ঝুঁকি আরও বেশি, এবং এর নেতিবাচক প্রভাব খুবই মারাত্মক (Bhabha 95)। অধিকারের নীতিশাস্ত্র এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে মানুষের বেশকিছু মৌলিক অধিকার রয়েছে, যার মধ্যে কিছু অবিচ্ছেদ্য এবং শর্তহীন, এবং অন্যগুলো শর্তসাপেক্ষ হিসেবে বিবেচিত। জীবনের অধিকার সম্পূর্ণরূপে অলঙ্ঘনীয় এবং অবিচ্ছেদ্য কিনা বা কোনো কোনো পরিস্থিতিতে এটি খর্ব করা যেতে পারে কিনা তা নিয়ে কিছু বিতর্ক রয়েছে (Khatchadourian 177-196)।

জাতিগত প্রোফাইলিংঃ জাতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে প্রোফাইলিং প্রায়ই ধর্ম, বর্ণ বা জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে ব্যক্তিদের প্রতি অযৌক্তিক তদন্ত এবং ভিন্ন আচরণের দিকে নিয়ে যায় তাই এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতির পরিপন্থী (Moeckli)। উদাহরণস্বরূপ, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ সালের সন্ত্রাসী হামলার পর, বিশেষ করে আরব জনগোষ্ঠী ও মুসলিম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জাতিগত প্রোফাইলিং এবং ধর্মীয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে (Coady 80-96)। এমনকি ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভ্রমণকারী এবং নাগরিকদের জাতিগত প্রোফাইলিং-এর ভিত্তিতে আলাদা করে। বেশ কিছু রাষ্ট্রে পুলিশ জাতিগত প্রোফাইলিং অনুশীলন করে এবং তাদের মতে, এটি অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর। অনেকের মতে, এটি বর্ণবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাতিগত প্রোফাইলিং ন্যায়সঙ্গত নয় (White JE.) । জাতিগত প্রোফাইলিং এর প্রতি সমর্থন বৈষম্য বৃদ্ধির পাশাপাশি জাস ইন বেলু (যা অ-যোদ্ধাদের উপর সরাসরি আক্রমণকে অন্যায় বলে ঘোষণা করে) নীতি লঙ্ঘন করে। তাছাড়া, জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায়ের উপর ভিত্তি করে পৃথকীকরণ সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের একটি কার্যকর দীর্ঘমেয়াদী কৌশলকে বাধাগ্রস্থ করে (Press 164–67)।

৩.৩ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঃ

১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ এর সন্ত্রাসী হামলার পরপরই, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ. বুশ ঘোষণা দেন যে, অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা হবে এবং এই উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তারা ১১ সেপ্টেম্বরের হামলাকে ভয়ঙ্কর অপরাধ ও গণহত্যা হিসেবে বিবেচনা করার পাশাপাশি সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনাকারী এবং ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন তাদেরকে গ্রেপ্তার এবং শাস্তিদানকে সরকারের অন্যতম মিশন হিসেবে নির্ধারণ করে। 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'- ধারণাটি সরকারী পদক্ষেপের ভিন্ন একটি কৌশল। এটি কোনো আইন নয় বরং যুদ্ধ। এটি নাটকীয়ভাবে অপরাধীদের বিচারের ও শাস্তিদানের পরিধিকে বিস্তৃত করে, কারণ এখানে যারা ১১ সেপ্টেম্বর সম্পর্কে কিছুই জানত না তাদেরকেও শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ডেভিড লুবান এই কৌশল (মডেল)কে যুদ্ধ-আইন মডেল হিসেবে ব্যাখ্যা করেন (White JE.

49) । নতুন যুদ্ধ মডেলে প্রথমত, সন্ত্রাসী বা অপরাধীদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততা ছাড়াই শত্রু সৈন্যদের উপর প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহার করা অনুমোদিত। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধে অ-যোদ্ধাদের অনিচ্ছাকৃত হত্যা অনুমোদিত। একজন খুনি সন্ত্রাসী ভিতরে অবস্থান করার পরেও লোকে পরিপূর্ণ একটি ভবন পুলিশ বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে না, তবে বিল্ডিংটিতে সামরিক কোনো লক্ষ্যবস্তু থাকলে বিমান বাহিনী বোমা বর্ষণ করে এটিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তৃতীয়ত, যুদ্ধক্ষেত্রে কারও উপর গুলি চালানোর আগে বা তাকে বন্দী করার আগে ব্যক্তিটি শত্রুপক্ষের কেউ কিনা এটা একজন সৈন্যকে যাচাই বা প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। আর এভাবেই, মার্কিন সামরিক বাহিনী ২০০২ সালের জানুয়ারিতে আফগানিস্তানের উরুজগান শহরে হামলার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেও কৈফিয়ত দিতে অস্বীকার করে। এ হামলায় ১৫ জন নিরপরাধ বেসামরিক লোক নিহত হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রতিরক্ষা সচিব রামসফেল্ড পরবর্তীতে স্বীকার করেন যে, ২৩শে জানুয়ারী খাস উরুজগানের হাজার কাদাম উপত্যকা গ্রামের একটি মাঠে যে ১৫ জন আফগান বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে তারা আল-কায়েদা বা তালেবান মিলিশিয়া বাহিনী ছিল না (Department Of State)। চতুর্থত, যুদ্ধে একজন শত্রুকে সে কোনো অপরাধ করেছে করেছে কি করে নাই তা বিবেচনা না করেই আক্রমণ করা যায়। যুদ্ধে যারা ক্ষতি করেছে তারা বৈধ লক্ষ্যবস্তু নয় বরং, তারাই- যারা ক্ষতি করতে পারে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই ন্যায়-যুদ্ধের ঐতিহ্যগত নীতির বিপরীতে অবস্থান করে। বরং, নতুন এই যুদ্ধ মডেলটি সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বন্দী, তাদের উপর প্রাণঘাতী শক্তির ব্যবহার এবং তাদেরকে হত্যার অনুমতি দিয়ে নিরপরাধ ব্যক্তির মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। কিন্তু ন্যায়যুদ্ধের ক্ষেত্রে, শত্রু বৈধভাবে লড়াই করতে পারে, অন্যান্য রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে যুদ্ধে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাছাড়া, জেনেভা কনভেনশনের অধীনে শত্রুসেনাদের যে অধিকারগুলো রয়েছে তা ন্যায়-যুদ্ধ মডেলে অনুমোদিত। অতএব, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ন্যায়যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে। যুদ্ধের এই নতুন মডেল অনুসারে সন্ত্রাসীরা অপরাধী, তাই তারা বৈধভাবে লড়াই করতে পারে না। বেআইনি হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারবেনা। এমনকি অন্য কোনো দেশ যদি সন্দেহভাজন কোনো সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দেয় বা সাহায্য করে তাহলে যুদ্ধের এই নতুন মডেল অনুযায়ী ঐ দেশটিও সন্ত্রাসবাদের পক্ষে। সন্দেহভাজন অপরাধীদের সাধারণ সেনা হিসেবে বিবেচনা না করে শত্রু যোদ্ধা হিসাবে গণ্য করা হয়। তাদের শুনানির কোনো অধিকার নেই এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য তাদেরকে আটক করে রাখা যেতে পারে। এমনকি তাদেরকে নির্যাতন করাও অনুমোদিত। অর্থাৎ, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই অনেকক্ষেত্রে নিরপরাধ ব্যক্তির মানবাধিকারের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। তাই ডেভিড লুবানের মতে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মানে মানবাধিকারের অবসান। কারণ নিরপরাধী যে কেউ সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে, আর একবার চিহ্নিত হলে তার কোনো অধিকার নেই (Luban 9-14)। Principle of Discrimination (বৈষম্যের নীতি) অনুসারে যারা যুদ্ধ করছে না (noncombatants), যেমন বেসামরিক নাগরিক, শিশু, বৃদ্ধ তাদের ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে আক্রমণ নিষিদ্ধ করে। এটি ন্যায় যুদ্ধ (just war) এর অন্যতম প্রধান নীতি যা - শুধু আগ্রাসী শত্রুপক্ষের সৈন্যদের হত্যা করার অনুমতি দেয়। এই নীতি অনুসারে জাতি, ধর্ম, বা বর্ণের ওপর ভিত্তি করে যখন কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর নিরপরাধ জনগণের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ অনৈতিক।

প্রযুক্তির অভাবনীয় বিকাশের ফলে বর্তমানে মানুষের চেহারার গঠন, চোখ, নাক, মুখের অবস্থান ইত্যাদি দেখে ব্যক্তিকে শনাক্ত করার বায়োমেট্রিক ফেস রিকগনিশন সিস্টেমকে অপরাধী শনাক্তকরণেও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে করে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ঝুঁকির পাশাপাশি কেবল মুখের গঠন, দেহের রঙ প্রভৃতি মিলে যাওয়ার কারনে চরমপন্থী গোষ্ঠীর নিরপরাধ সদস্যদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের স্বীকার হতে হয়। অনেক ফেস রিকগনিশন সিস্টেম ভুলে দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য বা আফ্রিকান বংশোদ্ভূত মানুষের চেহারার বৈশিষ্ট্যকে চরমপন্থী

ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সাথে মিলিয়ে ফেলে। যার ফলে - বায়োমেট্রিক যাচাইয়ের সময় এসব এলাকার মানুষের -ভিসা রিজেক্ট হওয়া, কিংবা অনেক সময় বিমানবন্দরে ভুলভাবে কাউকে সন্দেহভাজন হিসেবে শনাক্ত করে - ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ, মালামাল তল্লাশি, এমনকি আটক করার মত ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়। অনেক দার্শনিকের মতে, এই ধরনের আক্রমণাত্মক প্রযুক্তির ব্যাপক প্রবর্তন সন্ত্রাসীদের বিজয়েরই ইঙ্গিত বহন করে (Bewley-Taylor 85)। সমালোচকদের মতে, বায়োমেট্রিক ফেস রিকগনিশন সিস্টেমের মতো প্রযুক্তি একটি উন্মুক্ত সমাজের মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এই প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহার করা উচিত।

জাতি, ধর্ম, বা বর্ণের ওপর ভিত্তি করে যখন কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণকে স্বাভাবিক হিসেবে ধরে নেয়া হয় তখন তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং এটা শুধু বৈষম্যের স্বীকার সে গোষ্ঠীর জন্য নয়, বরং পুরো সমাজের জন্যই ক্ষতিকর (Aziz 33)। তাছাড়া জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের নীতিদর্শন অনুসারেও কোনো গোষ্ঠীর সাথে তাদের জাতি, ধর্ম, বা বর্ণের ওপর ভিত্তি করে বৈষম্যমূলক আচরণ করা বা এ ধরনের আচরণকে স্বাভাবিক করা সম্পূর্ণ অনৈতিক। কারন এটি তাঁর ক্যাটেগরিক্যাল ইম্পারেটিভের বিরোধী। এই নীতি অনুসারে কোন কাজ তখনই নৈতিক যখন- যে নিয়ম অনুসরণ করে এই কাজটি করা হয়েছে সে নিয়মটি সার্বজনীন নিয়ম বা আইন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। যদি জাতি বা ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য যদি সার্বজনীন নিয়ম হয়ে যায় তখন মানুষের মর্যাদা বা স্বাধীনতা বলতে কিছু আর থাকেনা। আবার কান্টের দ্বিতীয় নীতিটিতে বলা হয়েছে কোনো মানুষকে কোনো লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম বা উপায় হিসেবে ব্যবহার করা অনৈতিক। প্রতিটি মানুষের নিজস্ব মর্যাদা আছে তাই মানুষকে কেবল 'লক্ষ্য' হিসেবেই সম্মান করা উচিত। নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে (যেমন মুসলিম) সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আইন তৈরি ও প্রয়োগ সে গোষ্ঠীর মানুষকে সমাজের বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার উপায় হিসেবে ব্যবহার করার নামান্তর। এটা কান্টের দ্বিতীয় নীতির (মানুষকে কেবল 'লক্ষ্য' হিসেবেই সম্মান করা) পরিপন্থী। এটা অনৈতিক। কারণ এখানে (নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর) মানুষের অধিকার ও সম্মানকে বিসর্জন দিয়ে তাদেরকে সমাজের অন্যান্য সদস্যদের নিরাপত্তার 'উপায়' হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৪. উপসংহারঃ

মানবাধিকারের উপর সন্ত্রাসবাদের প্রভাবের এই নৈতিক বিশ্লেষণ চরমপন্থী সংগঠনের সাথে সম্পর্ক নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করে। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে সরাসরি জড়িত নয় এমন নিরপরাধ ব্যক্তি যারা সহিংসতা প্রত্যাখ্যানপূর্বক মানবাধিকারের নীতিগুলিকে সমর্থন করে তাদেরকে চিহ্নিত করা অত্যন্ত জরুরী। এটা স্বীকার করা অপরিহার্য যে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কোনো জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যকার একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু দ্বারা সংঘটিত হয়। এরা সমগ্র গোষ্ঠীর বিশ্বাস বা মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করে না। এই সম্প্রদায়ের নিরপরাধ সদস্যদের টার্গেট করার কারণে সমাজে বিভক্তি বাড়ে এবং সহিংসতা ও বৈষম্য আরও স্থায়ী হয়। চরমপন্থী সংগঠনের সাথে জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা গোষ্ঠীগত সম্পর্কের কারণে নিরপরাধ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও বৈষম্যমূলক আচরণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নৈতিক উদ্বেগ বাড়ায়। এটি মোকাবেলা করার জন্য গুটিকয়েক ব্যক্তির কর্মকাণ্ড দিয়ে সমগ্র সম্প্রদায়কে দোষারোপ করার পরিবর্তে কোনো ব্যক্তিকে তার ক্রিয়াকলাপের জন্য দায়ী করার সময় সহনশীলতা, বোঝাপড়া এবং ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর জনসাধারণের ধারণা গঠনে এবং বৈষম্য ও কুসংস্কার মোকাবেলায় সরকার, সুশীল সমাজ এবং মিডিয়া সকলকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা উচিত। যারা সন্ত্রাসবাদের সমর্থক নয়, তারা যাতে অন্যায়ভাবে বৈষম্য এবং কুসংস্কারের শিকার কিংবা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার উপকরণ, জাতীয় আইনি কাঠামো এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটাতে হবে।

তথ্যসূত্র

Aziz, Sahar F. “Sticks and Stones, The Words That Hurt: Entrenched Stereotypes Eight Years after 9/11.” *CUNY Law Review*, vol. 13, no. 1, Dec. 2009, p. 33. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.31641/clr130102.

Bhabha, Faisal A. "Tracking Terrorists' or Solidifying Tereotypes-Canada's Anti-Terrorism Act in Light of the Charter's Equality Guarantee." Windsor Rev. Legal & Soc. Issues 16 (2003): 95.

Bewley-Taylor, D.R. US concept wars, civil liberties and the technologies of fortification. Crime Law Soc Change 43, 81–111 (2005). https://doi.org/10.1007/s10611-005-4054-z

Coady, C. A. J. Tony. “Terrorism, Morality, and Supreme Emergency.” Terrorism, edited by Igor Primoratz, Palgrave Macmillan UK, 2004, pp. 80–96. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.1057/9780230204546_7.

Coady, C. A. J. “Terrorism, Morality, and Supreme Emergency.” *Ethics*, vol. 114, no. 4, July 2004, pp. 772–89. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1086/383440.

Corlett, J. Angelo. *Terrorism: A philosophical analysis*. Vol. 101. Springer Science & Business Media, 2003.

Department Of State. *The Office of Electronic Information, Bureau of Public Affairs*., https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/pubs/fs/33354.htm. Accessed 3 Aug. 2023

Discriminatory Profiles: Law Enforcement after 9/11 and 7/7. https://www.researchgate.net/publication/228160967_Discriminatory_Profiles_Law_Enforcement_after_911_and_77. Accessed 17 Sept. 2025.

Đorić, Marija. "Priručnik za prepoznavanje, prevenciju i suzbijanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma kod učenika." *Biro za operativnu koordinaciju–Nacionalni operativni tim, Podgorica* (2020). 13.

Donahue, Thomas J. "Terrorism, Moral Conceptions, and Moral Innocence." *Philosophical forum*. Vol. 44. No. 4. 2013.

Groetker, R. A. L. F. "Looking for Mohammed: data screening in search of terrorists." *Ethics of Terrorism and Counter-Terrorism* (2005): 301-318.

Hrabar, Sandra. "Politički terorizam i ekstremizam u zapadnoj Europi u drugoj polovici 20. st." *Rostra: Časopis studenata povijesti Sveučilišta u Zadru* 5.5. (2012): 281-286.

Ishay, Micheline. “What Are Human Rights? Six Historical Controversies.” *Journal of Human Rights*, vol. 3, no. 3, Sept. 2004, pp. 359–71. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1080/1475483042000224897.

Jeknić, Gordana Paović, Sonja Tomović-Šundić, and Ivan Jeknić. "LEGAL AND ETHICAL ASPECTS OF VIOLENT EXTREMISM AND TERRORISM." *How to deal with uncertainties in increasingly complex environment?(The new cartography of risk and crises)* (2022): 25.

Khatchadourian, H. (2005). Counter-terrorism: torture and assassination, In: G. Meggle (ed.), *Ethics of Terrorism and Counter-Terrorism*, 177-196, Ontos Verlag.

Luban, David, "The War on Terrorism and the End of Human Rights," (2002). from War After September 11 edited by Verna Gehring, pp. 9-14.

Luban, David. Torture, Power, and Law. 1st ed., *Cambridge University Press*, 2014. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.1017/CBO9781107279698.

Meggle, Georg, Andreas Kemmerling, and Mark Textor, eds. *Ethics of terrorism & counter-terrorism.* Vol. 3. Walter de Gruyter, 2013.

Moeckli, Daniel. “Terrorist Profiling and the Importance of a Proactive Approach to Human Rights Protection.” *SSRN Electronic Journal*, 2006. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.2139/ssrn.952163.

Nations, United. “Universal Declaration of Human Rights.” *United Nations*, United Nations, https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights. Accessed 20 July 2023.

Nickel, James. “Human Rights.” The Stanford Encyclopedia of Philosophy, edited by Edward N. Zalta, Fall 2021, *Metaphysics Research Lab*, Stanford University, 2021.

Press, William. “To Catch a Terrorist: Can Ethnic Profiling Work?” *Significance*, vol. 7, no. 4, Dec. 2010, pp. 164–67. Silverchair, https://doi.org/10.1111/j.1740-9713.2010.00452.x.

Rawls, John. "A theory of justice." *Applied ethics*. Routledge, 2017. 21-29.

“Terrorism.” *Wikipedia*, 13 Sept. 2025. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrorism&oldid=1311140120.

The Stanford Encyclopedia of Philosophy, edited by Edward N. Zalta, Fall 2021, *Metaphysics Research Lab*, Stanford University, 2021. https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/rights-human/. Accessed 2 Aug. 2023

“Universal Declaration of Human Rights.” *Wikipedia*, 29 July 2023. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Universal_Declaration_of_Human_Rights&oldid=1167730014. Accessed 2 Aug. 2023

Walzer, “Terrorism: A Critique of Excuses,” in *Problems of International Justice*, ed. Steven Luper-Foy (Boulder, Colo.: Westview, 1988)

White JE. Contemporary Moral Problems: War, Terrorism, Torture and Assassination. *Cengage Learning*; 2011, p.49

“মানবাধিকার.” উইকিপিডিয়া, 4 July 2023. *Wikipedia*, https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0&oldid=6736079.